31822 - হজ্ব আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি হজ্ব আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

হজ্ব একটি উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। এটি ইসলামের পঞ্চখুঁটির অন্যতম। যে ইসলাম দিয়ে আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যে খুঁটিগুলো ব্যতীত কোন ব্যক্তির দ্বীনদারি পূর্ণতা পেতে পারে না। যে কোন ইবাদত দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হতে হলে ও ইবাদত কবুল হতে হলে দুইটি বিষয় আবশ্যক:

এক. আল্লাহর জন্য মুখলিস বা একনিষ্ঠ হওয়া। অর্থাৎ সে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের কল্যাণকে উদ্দেশ্য করা; প্রদর্শনেচ্ছা, প্রচারপ্রিয়তার উদ্দেশ্যেনো করা অথবা অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে না-করা। দুই. কথা ও কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ জানা ছাড়া তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্ব পালনের মাধ্যমে অথবা অন্যকোন ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায় তার কর্তব্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ জেনে নেয়া। নিম্নে আমরা সুন্নাহ মোতাবেক হজ্ব আদায় করার পদ্ধতি সংক্ষেপে তুলে ধরব। ইতিপূর্বে আমরা উমরা আদায় করার পদ্ধতি 31819 নং প্রশ্নের জবাবে তুলে ধরেছি। উমরাআদায় করার পদ্ধতি সে প্রশ্নের উত্তর থেকে জেনে নেয়া যেতে পারে।
হজ্বের প্রকারভেদ:

হজ্ব তিন প্রকার: তামাত্তু, ইফরাদ ও ক্বিরান।

তামাত্তু হজ্ব: হজ্বের মাসসমূহে (হজ্বের মাস হচ্ছে- শাওয়াল, জ্বিলক্বদ, জ্বিলহজ্ব দেখুন আল-শারহুল মুমতি ৭/৬২) এককভাবে উমরার ইহরামবাঁধা, মক্কায় পৌঁছে তওয়াফ করা, উমরার সায়ী করা, মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছাটাই করে উমরা থেকে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর তারবিয়ার দিন অর্থাৎ ৮ জ্বিলহজ্ব এককভাবে হজ্বের ইহরাম বাঁধা এবং হজ্বের যাবতীয় কার্যাবলী শেষ করা। অতএব, তামাত্তু হজ্বকারী পরিপূর্ণ একটি উমরা পালন করেন এবং পরিপূর্ণ একটি হজ্ব পালন করেন। ইফরাদ হজ্ব: এককভাবে হজ্বের ইহরাম বাঁধা, মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করা, হজ্বের সায়ী করা, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট না করে তথা ইহরাম থেকে হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থেকে যাওয়া এবং ঈদের দিন জমরা আকাবাতে কংকর

নিক্ষেপের পর ইহরাম থেকে হালাল হওয়া। আর যদি হজ্বের সায়ীকে হজ্বের তওয়াফের পরে আদায় করতে চায় সেটাতেও কোন অসুবিধা নেই। ক্বিরান হজ্ব: উমরা ও হজ্বের জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা অথবা প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধা এরপর তওয়াফ শুরু করার আগে হজ্বকে উমরার সাথে সম্পৃক্ত করা (অর্থাৎ তওয়াফ ও সায়ীকে হজ্ব ও উমরার সায়ী হিসেবে নিয়ত করা)।ক্বিরান হজ্বকারীর আমলগুলো ইফরাদ হজ্বকারীর আমলের মত। তবে ক্বিরান হজ্বকারীর উপর হাদি আছে; ইফরাদ হজ্বকারীর উপর হাদি নেই। হজ্বের প্রকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে- তামাত্তু হজ্ব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে এই হজ্ব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই হজ্ব আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি যদি কেউ ক্বিরান হজ্ব বা ইফরাদ হজ্বের নিয়ত করে ফেলে তিনি তার ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করে হালাল হয়ে যাওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। যাতে করে সে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্ব পালনকারী হতে পারেন। এমনকি সেটা তাওয়াফে কুদুম ও সায়ীর পরও হতে পারে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাঁর বিদায়ী হজ্বে তওয়াফ ও সায়ী করার পর তাঁর সাহাবীগণকে নির্দেশ দেন- তোমাদের মধ্যে যার যার সাথে হাদি নেই সে যেন তার ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন: আমি যদি হাদি না নিয়ে আসতাম তাহলে তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিচ্ছি আমিও সেটা পালন করতাম। ইহরাম:একটু আগে যে প্রশ্নের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে সে প্রশ্নের উত্তরে ইহরামের সুন্নতগুলো যেমন- গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, নামায পড়া ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। ইহরামের আগে সে সুন্নতগুলো পালন করতে হবে। এরপর নামায শেষে করার পর অথবা নিজ বাহনে আরোহণ করার পর ইহরাম বাঁধবে। যদি তামাত্তু হজ্বকারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি উমরাতিন (অর্থ- হে আল্লাহ! উমরাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজির)।

আর যদি ক্বিরান হজ্ব আদায়কারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি হাজ্জাতিন ওয়া উমরাতিন (হে আল্লাহ! হজ্ব ও উমরাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজির)

আর যদি ইফরাদ হজ্বকারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা হাজ্জান (হে আল্লাহ! হজ্বকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজির)।

এরপর বলবেন: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة আল্লাহুম্মা হাযিহি হাজ্জাতুন লা রিয়াআ ফি-হা ওয়ালা সুমআ (হে

আল্লাহ! এ হজ্বকে এমন হজ্ব হিসেবে কবুল করুন যার মধ্যে লৌকিকতা ও প্রচারপ্রিয়তা নেই)। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে তালবিয়া পড়েছেন সেভাবে তালবিয়া পড়বে। সেই তালবিয়া হচ্ছে-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজির। আমি আপনার দরবারে হাজির। আমি আপনার দরবারে হাজির। আপনি নিরঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নেয়ামত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপনি নিরঙ্কুশ।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি তালবিয়া পড়তেন সেটো হচ্ছে-

لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ

লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্ব (অর্থ- ওগো সত্য উপাস্য! আপনার দরবারে হাজির)।

ইবনে উমর (রাঃ) আরেকটু বাড়িয়ে বলতেন:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

লাব্বাইকা ওয়া সাদাইক। ওয়াল খাইরু বি ইয়াদাইক। ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল। (অর্থ- আমি আপনার দরবারে হাজির, আমি আপনার সৌজন্যে উপস্থিত। কল্যাণ আপনার-ই হাতে। আকাঙ্ক্ষা ও আমল আপনার প্রতি নিবেদিত)। পুরুষেরা উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বে।আর নারীরা এভাবে পড়বে যেন পাশের লোক শুনতে পায়। যদি পাশে বেগানা পুরুষ থাকে তাহলে গোপনে তালবিয়া পড়বেন।

ইহরামকারী যদি কোন প্রতিবন্ধকতার আশংকা করেন যেমন রোগ, শত্রু বা গ্রেফতার ইত্যাদি তাহলে ইহরামকালে শর্ত করে নেয়া ভাল। ইহরামকালে তিনি বলবেন:

إِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

ইন হাবাসানি হাবিসে ফা মাহল্লি হাইসু হাবাসতানি (অর্থ- যদি কোন প্রতিবন্ধকতা - যেমন রোগ, বিলম্ব ইত্যাদি আমার হজ্ব পালনে- বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি যেখানেপ্রতিবন্ধকতার শিকার হই সেখানে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাব)।কেননা

দুবাআ বিনতে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম করাকালে তাকে শর্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: "তুমি যে শর্ত করছ সেটা তোমার রবের নিকট গ্রহণযোগ্য।"[সহিহ বুখারি (৫০৮৯) ও সহিহ মুসলিম (১২০৭)] যদি ইহরামকারী শর্ত করে থাকে এবং নুসুক পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তাহলে সে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। এতে করে তার উপর অন্য কোন দায়িত্ব আসবে না। আর যদি প্রতিবন্ধকতার কোন আশংকা না থাকে তাহলে শর্ত না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্ত করেননি এবং সাধারণভাবে সবাইকে শর্ত করার নির্দেশও দেননি। দুবাআ বিনতে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইহরামকারীর উচিত অধিক তালবিয়া পাঠ করা। বিশেষতঃ সময় ও অবস্থার পরিবর্তনগুলোতে। যেমন উঁচুতে উঠার সময়। নীচুতে নামার সময়। রাত বা দিনের আগমনকালে। তালবিয়া পাঠের পর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

উমরার ইহরামের ক্ষেত্রে ইহরামের শুরু থেকে তওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়ার বিধান রয়েছে। আর হজ্বের ক্ষেত্রে ইহরাম করার পর হতে ঈদের দিন জমরা আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়ার বিধান।

মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল: মক্কারকাছাকাছি পৌঁছলে সম্ভব হলে মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করে নিবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবেশের সময় গোসল করেছিলেন।[সহিহ মুসলিম (১২৫৯)]

এরপর মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিবে এবং বলবে:

بِسْمِ اللهِ والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَأَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(অর্থ- আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমার জন্য আপনার রহমতের দুয়ারগুলো খুলে দিন। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান চেহারার মাধ্যমে, তাঁর অনাদি রাজত্বেরমাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

এরপর তওয়াফ শুরু করার জন্য হাজারে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে যাবে। তওয়াফ করার পদ্ধতি ইতিপূর্বে (31819) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তওয়াফের পর ও তওয়াফের দুই রাকাত নফল নামাযের পর মাসআ (সায়ী করার স্থান) এর দিকে এগিয়ে যাবে এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সায়ী (প্রদক্ষিণ) করবে। (31819) নং প্রশ্নের জবাবে সায়ীর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে

তামাত্তু হজ্বকারী উমরার সায়ী করবেন। আর ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্বকারী হজ্বের সায়ী করবেন এবং ইচ্ছা করলে সায়ীটি হজ্বের ফরজ তওয়াফের পরেও আদায় করতে পারেন।

মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা:

তামাত্তু হজ্বকারী যখন সায়ীর সাত চক্কর শেষ করবেন তখন তিনি পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করতে পারেন অথবা চুল ছোট করতে পারেন। যদি মাথা মুণ্ডন করলে মাথার সর্বাংশ মুণ্ডন করতে হবে। অনুরূপভাবে চুল ছোট করলেও মাথার সর্বাংশের চুল ছোট করতে হবে। চুল ছোট করার চেয়ে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দুআ করেছেন। আর চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দুআ করেছেন।[সহিহ মুসলিম (১৩০৩)]তবে হজ্বের সময় যদি অতি নিকটবর্তী হয় এবং নতুন চুল গজাবার মত সময় না থাকে তাহলে চুল ছোট করা উত্তম; যাতে হজ্বের সময় মাথা মুণ্ডন করতে পারেন। দলিল হচ্ছে- বিদায় হজ্বকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে উমরার জন্য মাথার চুল ছোট করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তাঁরা জ্বিলহজ্ব মাসের ৪ তারিখ সকাল বেলায় মক্কা পৌঁছেছিলেন। আর নারীরা আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ চুল কেটে নিবে। এর মাধ্যমে তামাত্তু হজ্বকারীর উমরার কাজ শেষ হলো এবং তামাত্তু হজ্বকারী সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে গেলেন। অর্থাৎ হালাল অবস্থায় একজন মানুষ যা যা করতে পারে (যেমন- সেলাইকৃত পোশাক পরা, সুগন্ধি লাগানো, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি)এখন তামাত্তু হজ্বকারীও সেসব পারবেন।

পক্ষান্তরে ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্বকারী মাথা মুণ্ডন করবেন না; কিংবা মাথার চুল ছোট করবেন না; তারা ইহরাম থেকে হালাল হবেন না। বরং ইহরাম অবস্থায় থাকবেন এবং ঈদের দিন জমরা আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটাই এর মাধ্যমে হালাল হবেন।

তারবিয়ার দিন তথা জ্বিলহজ্বের ৮ তারিখে তামাত্তু হজ্বকারী মক্কায় তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে। উমরার ইহরামকালে যা যা করা মুস্তাহাব ছিল হজ্বের ইহরামের সময়ও তা তা করা (যেমন- গোসল, সুগন্ধি লাগানো, নামায ইত্যাদি)মুস্তাহাব। এই ইহরামের সময় হজ্বের নিয়ত করবেন, তালবিয়া পড়বেন এবং মুখে বলবেন: لبيك اللهم حجاً(হে আল্লাহ! হজ্বকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজির)। যদি হজ্ব সমাপ্তকরণে কোন প্রতিবন্ধকতার আশংকা করে তবে শর্ত করে নিবে। وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني(অর্থ- যদি কোন প্রতিবন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে আমি যেখানে আটক হই সেখানে হালাল হয়ে যাব)। আর যদি এমন কোন আশংকা না থাকে তাহলে শর্ত করবে না। হাজ্বীর জন্য মুস্তাহাব হলো ঈদের দিন জমরা আকাবাতে কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

মীনায় গমন:

এরপর মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। সেখানে পৌঁছে জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায কসর (৪ রাকাতের স্থলে ২ রাকাত) করে ঠিক ঠিক ওয়াক্তে আদায় করবে। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীনাতে নামাযগুলো কসর করতেন; কিন্তু একত্রে আদায় করতেন না।

কসর: ৪রাকাত বিশিষ্ট নামাযগুলো ২ রাকাত করে আদায় করা। মক্কাবাসী এবং অন্য সকলে মীনা, আরাফা ও মুজদালিফাতে

নামায কসর করবেন। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্ব আদায়কালে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতেন। তাঁর সাথে মক্কাবাসীরাও ছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ নামায পড়ার নির্দেশ দেননি। যদি তা ফরজ হতো তাহলে তিনি তাদেরকে সে নির্দেশ দিতেন যেভাবে মক্কা বিজয়ের বছর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মক্কার দালানকোঠা প্রসারিত হতে হতে মীনা মক্কার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যেন মীনা মক্কারই একটি মহল্লা। তাই মক্কাবাসীরা সেখানে কসর করবে না। আরাফায় গমন:

আরাফার দিন সূর্যোদয়ের পর মীনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে। সম্ভব হলে জোহরের পূর্ব পর্যন্ত নামিরাতে অবস্থান করবে (নামিরা হচ্ছে- আরাফার সম্মুখভাগের একটি স্থান)। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কারণ নামিরাতে অবস্থান করা সুন্নত; ওয়াজিব নয়। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর (অর্থাৎ জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর) জোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে জোহরের ওয়াক্তে দুই রাকাত দুই রাকাত করে আদায় করে নিবে; ঠিক যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদায় করেছিলেন যাতে করে আরাফার মাঠে লম্বা সময় অবস্থান করে দুআ করতে পারেন। নামাযের পর আল্লাহর যিকির ও দুআতে মশগুল হবে। আল্লাহর কাছে রোনাজারি করবে, দু হাত তুলে কিবলামুখি হয়ে যা ইচ্ছা দুআ করবে। যদি কিবলামুখি হতে গিয়ে জাবালে আরাফা পিছনে পড়ে যায় কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু দুআর ক্ষেত্রে সুন্নত হচ্ছে- কিবলামুখি হওয়া; পাহাড়মুখি হওয়া নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন: "আমি এখানে অবস্থান করলাম; আরাফার ময়দানের সর্বাংশঅবস্থানস্থল।"সেই মহান দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুআটি সবচেয়ে বেশি করেছেন সেটো হচ্ছে-

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরিকা লাহ। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির। (অর্থ- এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি নিরঙ্কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্য। প্রশংসা তাঁর-ই জন্য। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান)। যদি কিছুটা একগেঁয়েমি এসে যায় এবং সঙ্গী-সাথীদের কথাবার্তা বলে কিছুটা সতেজ হতে চায় তাহলে ভাল কথা বলবে এবং ভাল কোন বই পড়বে। বিশেষতঃ আল্লাহ তাআলার বদান্যতা, তাঁর মহান অনুগ্রহ বিষয়ক কোন বই পড়বে। যাতে সে মহান দিনে আল্লাহর প্রতি আশার দিকটা ভারী থাকে। এরপর পুনরায় আল্লাহর কাছে রোনাজারি ও দুআতে ফিরে আসবে এবং দিনের শেষভাগকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হবে। কেননা সবচেয়ে উত্তম দুআ হচ্ছে- আরাফা দিবসের দুআ।

মুজদালিফাতে গমনঃ

সূর্য ডোবার পরে মুজদালিফাতে গমন করবে। মুজদালিফাতে পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামায এক আযান দুই ইকামতে আদায় করবে। যদি এই আশংকা হয় যে, মুজদালিফাতে পৌঁছতে পৌঁছতে মধ্যরাত পার হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে রাস্তায় নামায আদায় করে নিবে। কারণ নামাযকে মধ্যরাতের বেশি বিলম্ব করে পড়া জায়েয হবে না। মুজদালিফাতে এসে রাত্রি যাপন করবে।

ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর বিলম্ব না করে এক আযান ও এক ইকামতে ফজরের নামায পড়ে নিবে। এরপর আল-মাশআর আল-হারামের দিকে এগিয়ে যাবে (বর্তমানে মুজদালিফাতে মসজিদটি যে স্থানে রয়েছে এটি সেই জায়গা)। সেখানে গিয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিবে, আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবে তথা তাকবীর বলবে এবং ইসফার (ইসফার মানে- সূর্যোদয়ের আগে পূর্বদিক ফর্সা হয়ে উঠা) হওয়া পর্যন্ত যা খুশি দুআ করবে। যদি আল-মাশআর আল-হারামে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে নিজ স্থানে অবস্থান করে দুআ করবে। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আমি এ স্থানে অবস্থান করলাম। জাম্মতথা গোটা মুজদালিফাই অবস্থানস্থল।”হাত উঁচু করে কিবলামুখি হয়ে দুআ ও যিকির করবে।

মীনায় গমনঃ

সূর্যোদয়ের পূর্বে আকাশ ভালভাবে ফর্সা হয়ে উঠলে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে। ওয়াদি মুহাসসার (মুজদালিফা ও মীনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা) দ্রুত পার হবে। মীনায় পৌঁছে অপেক্ষাকৃত মক্কার নিকটবর্তী ‘আকাবা’ নামক জমরাতএকটির পর একটি করে মোট৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকরের আকার হবে প্রায় ছোলার সম-পরিমাণ। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। জমরা আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করার সুন্নত পদ্ধতি হলো- জমরাকে সামনে রাখবে, মক্কাকে বামে রাখবে এবং মীনাকে ডানে রাখবে। কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করার পর হাদি যবেহ করবে। এরপর পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে অথবা মাথার চুল ছোট করবে। আর মহিলা হলে আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ চুল কাটবে। (এর মাধ্যমে ইহরাম থেকে প্রাথমিক হালাল অর্জিত হবে; অর্থাৎ এ হালাল হওয়ার মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সবকিছু হাজী সাহেবের জন্য হালাল হলো।)এরপর মক্কা গমন করে হজ্বের তওয়াফ ও সায়ী করবে। (এর মাধ্যমে হাজী সাহেব দ্বিতীয় হালাল হবে। এ হালালের মাধ্যমে ইহরামের কারণে যা কিছু হারাম হয়েছিল সবকিছু হাজীর জন্য হালাল হবে)। কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডনের পর তওয়াফ করার জন্য মক্কায় যেতে চাইলে সুন্নত হচ্ছে- সুগন্ধি লাগানো। দলিল হচ্ছে আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস “আমি ইহরাম করার আগে ইহরামের জন্য এবং হালাল হওয়ার পর তওয়াফের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।” [সহিহ বুখারি (১৫৩৯) ও সহিহ মুসলিম (১১৮৯)]। এরপর তওয়াফ ও সায়ী করার পর মীনাতে ফিরে আসবে। জ্বিলহজ্বের একাদশ ও দ্বাদশ রজনী মীনাতে কাটাবে এবং সে দু’দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর তিনটি জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করবে। উত্তম হচ্ছে- কংকর নিক্ষেপের জন্য হেঁটে যাওয়া। বাহনে চড়ে গেলেও অসুবিধা নেই। প্রথমে প্রথম জমরাতে এক এক করে পরপর ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। এই জমরাটি মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে ও মসজিদে খাইফের নিকটে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপকালে তাকবীর বলবে। এরপর একটু অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যা ইচ্ছা দুআ করবে। যদি দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো ও দুআ করা কারো জন্য কষ্টকর হয় তাহলে সাধ্যানুযায়ী অল্প সময়ের জন্য হলেও দুআ করবে; যেন সুন্নত পালন হয়। এরপর মধ্যবর্তী জমরাতে একের পর এক মোট ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলবে। এরপর সামান্য বামে সরে গিয়ে কিবলামুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং হাত উঁচু করে সম্ভব হলে লম্বা সময় ধরে দুআ করবে। লম্বা সময় দুআ করা সম্ভব না হলে সামান্য সময়ের জন্য হলেও দাঁড়িয়ে দুআ করবে। এই দুআটি

ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। যেহেতু এটি সুন্নত। অনেক মানুষ না জানার কারণে অথবা অবহেলা করে এ সুন্নতটি ছেড়ে দেয়। কখনো কোন সুন্নত যদি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে তখন সে সুন্নতের উপর আমল করা ও মানুষের মাঝে এর প্রসার করাঅধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যেন এ সুন্নতটি একেবারে মিটে না যায়।

এরপর জমরা আকাবাতে একের পর এক মোট ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। এই জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করার পর দাঁড়াবে না ও দুআ করবে না। এভাবে ১২ই জ্বিলহজ্ব ৩টি জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করার পর ইচ্ছা করলে দেরী না করে সেদিনই মীনা ত্যাগ করে চলে আসতে পারে। আর চাইলে ১৩ই জ্বিলহজ্ব রাত্রি মীনাতে অবস্থান করে পরদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর ৩টি জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করে মীনা ত্যাগ করতে পারে। একদিন দেরী করে মীনা ত্যাগ করাটা উত্তম; তবে ওয়াজিব নয়। কিন্তু ১২ ই জ্বিলহজ্ব সূর্যোদয়ের সময়ও কেউ যদি মীনাতে অবস্থান করে তাহলে তার জন্য ১৩ ই জ্বিলহজ্ব রাত্রি মীনাতে কাটানো ও পরদিন ৩টি জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। তবে মীনাতে সূর্য ডুবে যাওয়া যদি তার এখতিয়ারের বাইরের কোন কারণে হয় যেমন কেউ তাবু ত্যাগ করে গাড়ীতে চড়েছে কিন্তু রাস্তায় জ্যাম বা এ জাতীয় কোন কারণে আটকা পড়ে যায় তাহলে ১৩ তারিখ পর্যন্ত দেরি করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কারণ এ বিলম্বটা তার এখতিয়ারভুক্ত নয়। অতঃপর যখন মক্কা ত্যাগ করে নিজ দেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন বিদায়ী তওয়াফ না করে মক্কা ত্যাগ করবে না। দলিল হচ্ছে- “তোমাদের কেউ প্রস্থান করবে নাযতক্ষণ না সে শেষ কাজ বায়তুল্লাহতে (তওয়াফ) না করে।”[সহিহ মুসলিম (১৩২৭)] অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে- “লোকদেরকে আদেশ করা হয়েছে- তাদের সর্বশেষ আমল যেন হয় বায়তুল্লাহতে (তওয়াফ)। তবে হায়েযগ্রস্ত নারীকে এ ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে।”[সহিহ বুখারি (১৭৫৫) ও সহিহ মুসলিম (১৩২৮)] হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীদের উপর বিদায়ী তওয়াফ নেই এবং তাদের জন্য মসজিদে হারামের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিদায় জানানোটাও উচিত নয়। কারণ এ ধরনের পদ্ধতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়নি। যখন দেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন হাজী সাহেবের সর্বশেষ কাজ হবে তওয়াফ। যদি বিদায়ী তওয়াফ করার পর সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে হয় অথবা মালপত্র বাহনে উঠানোর জন্য অপেক্ষা করতে হয় অথবা পথের সম্বল হিসেবে কিছু কিনতে হয় এতে কোন অসুবিধা নেই। এর জন্য পুনরায় তওয়াফ করতে হবে না। তবে যদি সফর বিলম্বের নিয়ত করতে হয় (উদাহরণতঃ সফর ছিল দিনের পূর্বাহ্ণে এবং বিদায়ী তওয়াফ করে নিয়েছে কিন্তু পরে যদি সফর দিনের অপরাহ্ণে) করতে হয় তাহলে পুনরায় বিদায়ী তওয়াফ করে নেয়া ওয়াজিব; যাতে সর্বশেষ আমলটা তওয়াফ হয়। হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর ইহরামকারীর উপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ওয়াজিবঃ

১. ইসলামী যাবতীয় অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা। যেমন- ঠিক সময়ে নামাযগুলো আদায় করা।

২. আল্লাহ যা যা নিষেধ করেছেন যেমন পাপ কথা, পাপ কাজ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী:“অতএব, এই মাসসমূহে যে ব্যক্তি নিজের উপর হজ্বকে আবশ্যক করে নিল তার জন্য হজ্বে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৭]

৩. পবিত্র স্থানগুলোর ভিতরে অথবা বাইরে কথা বা কাজের মাধ্যমে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

৪. ইহরামঅবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ সেগুলো থেকে বিরত থাকা:

ক. চুল বা নখ না কাটা।তবে কাঁটা বা এ জাতীয় কিছু তুলে ফেললে রক্ত বের হলেও গুনাহ হবে না।

খ. ইহরাম বাঁধার পর শরীরে, পরিধেয় পোশাকে বা খাবার-দাবারে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার করবে না। তবে ইহরামের আগে ব্যবহারকৃত সুগন্ধির কোন আলামত যদি থেকে যায় এতে কোন অসুবিধা নেই।

গ. শিকার করবে না।

ঘ. স্ত্রী সহবাস করবে না।

ঙ. উত্তেজনাসহ স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরবে না, চুমু খাবে না বা এ জাতীয় কিছু করবে না।

চ. নিজে বিয়ের চুক্তি করবে না অথবা অন্য কারো বিয়ের আকদ পড়াবে না অথবা কোন নারীকে নিজের জন্য অথবা অন্য কারো জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিবে না।

ছ. হাতমোজা পরবে না। তবে কোন ন্যাকড়া দিয়ে হাত পেঁচালে গুনাহ হবে না।

এই সাতটি নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান। তবে বিশেষভাবে পুরুষের জন্য কাজগুলো হচ্ছে-

-এঁটে থাকা কোন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকবে না। তবে ছাতা দিয়ে, গাড়ীর ছাদের আড়ালে, তাবুর আড়ালে ছায়া নিতে অথবা মাথায় বোঝা বহন করতে কোন দোষ নেই।

-সেলাইকৃত জামা, পাগড়ী, টুপি, পায়জামা, মোজা পরা যাবে না। তবে লুঙ্গি না পেলে পায়জামা পরবে। জুতা না পেলে মোজা পরবে।

-ইতিপূর্বে উল্লেখিত পোশাকগুলোর স্থলাভিষিক্ত কোন পোশাকও পরা যাবে না। যেমন- জুব্বা, ক্যাপ, টুপি, গেঞ্জি ইত্যাদি।

-জুতা, আংটি, চশমা, হেডফোন ইত্যাদি পরা যাবে। হাতে ঘড়ি পরা যাবে, গলায় হার পরা যাবে। টাকা-পয়সা রাখার জন্য বেল্ট পরা যাবে।

-সুগন্ধিহীন কিছু দিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া যাবে। মাথা ও শরীর ধোয়া যাবে ও চুলকানো যাবে। এতে করে

অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো চুল পড়ে গেলে তাতে কোনো দোষ নেই।

নারীরা নেকাব পরবে না। নেকাব হচ্ছে- এমন কাপড় যা দিয়ে নারীরা তাদের মুখ ঢেকে রাখে; শুধু চোখ দুটি দেখা যায়। নারীদের জন্য সুন্নত হচ্ছে- মুখ ঢেকে রাখা। তবে যদি বেগানা পুরুষদের দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ইহরাম অবস্থায় অথবা ইহরামের বাইরে মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

দেখুন: আলবানীর “মানাসিকুল হজ্জ ওয়ার উমরাহ” এবং শাইখ উছাইমীনের “সিফাতুল হজ্ব ওয়াল উমরা” ও “আল-মানহাজ লি মুরিদিল উমরা ওয়াল হাজ্জ”